কাঙ্খিত ফলন অর্জনের উপায়সমূহ

How to obtain potential yield

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গাজীপুর।

কাঙ্খিত ফলন অর্জনের উপায়সমূহ

রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়

ড. মো: জহিরুল ইসলাম, ড. মো: ইসলাম উদ্দিন মোল্লা, ড. মো: ফজলুল ইসলাম ও মো: শাহাদাত হোসেন

কারিগরী সহায়তায়

বিআরকেবি ওয়ার্কিং গ্রুপ

আর্থিক সহায়তায়

বিআরকেবি-ব্রি-এনএটিপি-বিএআরসি উপ-প্রকল্প

পরিকল্পনা, গবেষণা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. মো: ইসলাম উদ্দিন মোল্লা

ডিজাইনে

মো: আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।

কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জনের উপায়সমূহ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	সঠিক জাত নির্বাচন	১
২.	মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার	১
৩.	বীজ বাছাই	১
৪.	বীজ শোধন	২
৫.	জাগ দেয়া	২
৬.	বীজতলা তৈরি	২
৭.	বীজের পরিমাণ	২
৮.	বীজতলার যত্ন	২
৯.	চারার বয়স	২
১০.	চারা উঠানো	৩
১১.	চারা বহন	৩
১২.	জমি তৈরি	৩
১৩.	চারা রোপণ	৩
১৪.	চারা রোপণের সময়	৪
১৫.	সার ব্যবস্থাপনা	৪
১৬.	আগাছা দমন	৬
১৭.	সেচ ব্যবস্থাপনা	৭
১৮.	পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা	৮
১৯.	রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা	১০
২০.	ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ	১২

কাঙ্খিত ফলন অর্জনের উপায়সমূহ

ভূমিকা

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন মৌসুম উপযোগী ৫৭টি ইনব্রিড এবং ৪টি হাইব্রিড সহ মোট ৬১টি উফশী জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। দেশে আবাদকৃত উফশী ধানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ব্রি ধান২৮ এবং ব্রি ধান২৯ এর গড় ফলন বিঘা প্রতি বোরো মৌসুমে যথাক্রমে ২২.০ এবং ২৭.৫ মণ। তবে এদের সম্ভব্য ফলন (Potential yield) এর চাইতেও বেশি। অথচ আমদের ধানের জাতীয় গড় ফলন বিঘা প্রতি মাত্র ১১.৯০ মণ। ধান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। লাভজনক ধান চাষের জন্য ফলন বৃদ্ধির অন্য কোন বিকল্প নেই। তাই ধান চাষের প্রতিটি স্তরে গবেষণালব্ধ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তির ধারাবাহিক বিবরণ নিমেণ প্রদত্ত হল।সর্বোচ্চ ফলন পেতে হলে ধান চাষের প্রতিটি স্তরে আধুনিক প্রযুক্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

১. সঠিক জাত নির্বাচন

প্রথমে চাষ এলাকার মাটি, মৌসুম, আবহাওয়া, পরিবেশ, চাহিদা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী সঠিক জাতটি নির্বাচন করুন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। সঠিক জাত নির্বাচন ছাড়া কাঙ্খিত ফলন অর্জন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

২. মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার

ভাল বীজে ভাল ফসল। তাই পরিপুষ্ট, মিশ্রণমুক্ত, পরিষ্কার, পোকামাকড় ও রোগবালাইমুক্ত এবং ৮০% বা তার বেশি অংকুরোধগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করতে পারলে ভাল।

ভাল বীজ

৩. বীজ বাছাই

বপনের পূর্বে পুষ্ট ও সুস্থ সবল বীজ নিশ্চিত করতে হবে।কারণ ভাল বীজ মানে সুস্থ সবল চারা এবং অধিক ফলন। বীজ বাছাইয়ের জন্য নিমণবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে নিন। এতে ১০ কেজি বীজ ধান ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, নষ্ট ও হালকা বীজ উপরে ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে নিন। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিন। সার মেশানো পানি অন্য ফসলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজ বাছাই পদ্ধতি

৪. বীজ শোধন

বাছাইকৃত বীজ কাপড় বা চটের ব্যাগে ভরে ঢিলা করে বেঁধে নিন। এবার প্রতি কেজি বীজের জন্য এক লিটার পানি এবং তিন গ্রাম হারে ব্যাভিসিটন/নোইন/ইভাজিম/গিলজিম/টপসিল-প্লাস/হেডাজিম/সালফানেট এর যে কোনটি একটি পাত্রে মিশিয়ে নিন। এরপর বীজের পোটলাটি ১২ ঘন্টা মিশ্রিত পানিতে ভিজানোর পর পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৬-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। এভাবে বীজ শোধনও হল এবং সঠিক ভাবে ভিজেও গেল। বীজ শোধন করলে ফসলে বীজবাহিত ছত্রাক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫. জাগ দেয়া

বীজ শোধনের পর বীজের পোটলাটি পানি থেকে তুলে ইট বা কাঠের টুকরোর উপর ঘন্টাখানেক রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২-৩ সস্তর শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের পোটলাটি রাখুন এবং আবারও ২-৩ স্তর শুকনো খড় দিয়ে ভালভাবে চেপে তার উপর ইট বা কোন ভারী বস্তু দিয়ে চাপে রাখার ব্যবস্থা করুন। এভাবে জাগ দিলে আউশ এবং আমন মৌসুমে ৪৮ ঘন্টা এবং বোরো মৌসুমে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ভাল বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

৬. বীজতলা তৈরি

বীজতলা তৈরি ও সমানকরণ

মানসম্মত চারা উৎপাদনে জন্য আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে। দোঁআশ ও এটেল মাটি বীজতলার জন্য ভাল এবং জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। চাষ ও মই দিয়ে আগাছা ও খড় পচিয়ে ভালভাবে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে এবং দুই বেডের মাঝে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। ফাঁকা জায়গার কাদা মাটি দিয়ে উচু বেড তৈরি করা যায় এবং এতে নালা তৈরি করা সম্ভব। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বাকাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বীজতলা বেশি কাদাময় হলে কয়েক ঘন্টা শুকিয়ে নেওয়া পর সমভাবে বীজ বোনা দরকার। দুই বীজতলার মাঝে যে নালা তৈরি হবে তা দিয়ে সেচ বা পানি নিষ্কাশন ছাড়াও বিভিন্ন পরিচর্যা করার জন্য চলাচল সহজতর হয়।

৭. বীজের পরিমাণ

সুস্থ সবল চারা পেতে হলে প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৩-৪ কেজি বীজ অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৮০-৮৫ গ্রাম বীজ বোনতে হবে। এক বর্গমিটারের চারা দিয়ে ২০-২৫ বর্গমিটার জমি রোপণ করা যায়।

৮. বীজতলার যত্নণ

বীজতলার যত্ন

বীজ বপনের পর প্রয়োজনে ৪-৫ দিন পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ বপনের ৩-৪ দিন পর চারা গজানো পর্যন্ত সেচের পানি দ্বারা নালা ভর্তি করে রাখতে হবে। প্রয়োজনে বীজতলায় জমে থাকা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। চারা গজানোর ২ সপ্তাহ পরে গাছ হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া এবং প্রয়োজনে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম জিপসাম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সময়মত আগাছা ও পোকামাকড় দমন করতে হবে।

৯. চারার বয়স

অধিক ফলনের জন্য ধানের চারার বয়স আউশ মৌসুমে ২০-২৫ দিন, আমন মৌসুমে ২৫-৩০ দিন এবং বোরোতে ৪০-৪৫ দিনের হওয়া উচিত। পাঁচ পাতা বিশিষ্ট ধানের চারা রোপণ করা উত্তম। চারা সঠিক বয়সের না হলে ধানের ফলন অনেকাংশে কমে যায়।

১০. চারা উঠানো

চারা উঠানোর আগে বীজতলায় প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে ভিজিয়ে মাটি নরম করে নিতে হবে। যত্ন সহকারে বীজতলা থেকে চারা উঠাতে হবে, যাতে চারার কান্ড বা গোড়া ভেঙ্গে না যায়। টেনে হেচঁড়ে চারা তোলার পর আছাড় দিয়ে মাটি পরিষ্কার করলে চারার খুবই ক্ষতি হয় এবং রোপিত চারার বাড়-বাড়তি বিলম্বিত হয়। চারার শিকড় ছিড়ে গেলে রোপণের পর চারার বাড়-বাড়তির অসুবিধা হয় না কিন্তু কান্ড ভেঙ্গে বা মুচড়ে গেলে চারা গাছের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সে জন্য চারা তোলার পর ঐ চারার পাতা দিয়ে আটি বাধাও উচিত নয়। শুকনো খড় ভিজিয়ে আটি বাধঁতে হবে।

যত্নসহকারে চারা উঠানো

১১. চারা বহন

রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কান্ড মোড়ানো পরিহার করতে হবে। ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে চারা পরিবহন করা উচিত। বস্তা বন্দী করে চারা কোনক্রমেই বহন করা উচিত নয়।

১২. জমি তৈরি

উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে, যাতে আগাছা ও খড়কুটা ভালভাবে পচে যায়। উত্তমরূপে কাদা করে তৈরি জমিতে পানির অপচয় কম হয়, নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বাড়ে, অনেক আগাছা দমন হয় এবং সহজে চারা রোপণ করা যায়। রোপণের পূর্বে জমি সমতল হওয়া চাই। এতে সার ও পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আগাছা কম হবে। সমতল জমিতে একই সময়ে ফসল পাকবে যা ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

জমিত তৈরী

১৩. চারা রোপণ

রোপণোত্তর সুষ্ঠু পরিচর্যার জন্য চারা সারিতে রোপণ করা উত্তম। মৌসুম ও জাত ভেদে সারি থেকে সারির দুরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারা ১৫-২০ সেন্টিমিটার দুরত্বে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার নির্ধারিত দুরত্ব বজায় রেখে জমিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গুছির মাধ্যমে অভিষ্ট ফলন অর্জন করা সম্ভব। সারিতে চারা রোপণ করলে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার এবং গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে সারের খরচ কমিয়ে প্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যায়। উপরমন্ত্ম সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ করলে প্রত্যেক গাছ সমান আলো-বাতাস ও সার গ্রহণের সুবিধা পায় বিধায় ফলন বাড়ে। মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম। সঠিক গভীরতায় চারা রোপণ করলে চারার বাড়-বাড়তি দ্রুত শুরু হয় এবং কুশির সংখ্যা বাড়ে। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে কোন চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণ

১৪. চারা রোপণের সময়

নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ধান চাষ করলে মৌসুমভেদে ধানের ফলন বিঘায় ৪-৭ মণ কমে যেতে পারে। সুতরাং অধিক ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে ধান রোপণ করতে হবে।

আউশঃ আউশ ধানের বপন ও রোপণ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তবে এ মৌসুমে রোপণ বা বপনের সময় বৃষ্টির জন্য কিছু আগে পরে হলেও ফলনের তেমন কোন পার্থক্য হয় না। ঠিকমত বৃষ্টি হলে বৈশাখের প্রথমে জমিতে বীজ বপন বা বীজতলায় চারা তৈরি করা ভাল।

আমনঃ এ মৌসুমে ধানের চারা শ্রাবণের প্রথম থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত রোপণ করা যায়। তবে ১৫ ভাদ্রের পর যতই দেরিতে ধানের চারা রোপণ করা হবে ফলনও সেই হারে কমতে থাকবে। ভাদ্র মাসের পরে কোন ধান রোপণ করা উচিত নয়। আমনে ১৫-৩০ আষাঢ় বীজ বপন করে ১৫-৩০ শ্রাবণের মধ্যে চারা রোপণ করে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বোরোঃ যে সমসত্ম জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার চেয়ে কম সে জাতগুলোর বীজ অগ্রহায়ণ মাসের শুরম্নতে বপন করতে হবে। আবার যে জাতগুলোর জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি সেগুলো ২০ কার্তিক থেকে বীজ বপন করা যাবে। উক্ত সময়ে বীজ বপন করে ৪০-৪৫ দিনের চারা রোপণের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বোরো ধানের রোপণ ১৫ মাঘের মধ্যে শেষ করা উচিত। এরপর রোপণ করলে জীবনকাল ও ফলন উভয়ই কমে যাবে।

১৫. সার ব্যবস্থাপনা

সার ধান উৎপাদনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। কোন সার কি পরিমাণে এবং কখন প্রয়োগ করতে হবে তার উপর ফলন অনেকাংশ নির্ভর করে। নিবিড় চাষাবাদের জন্য জমির উর্বরা শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। কাঙ্খিত ফলনের জন্য সুষম সার সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

ক. ইউরিয়া (নাইট্রেজেন) সার

ধানের ফলন বৃদ্ধিতে নাইট্রেজেন সারের ভূমিকা সর্বাধিক।নাইট্রেজেন গাছের বৃদ্ধি সাধন করে, পাতার রঙ সবুজ করে এবং কুশির সংখ্যা বাড়ায়। ধান গাছ তার সম্পূর্ণ জীবনকালেই নাইট্রেজেন সার গ্রহণ করে। তবে সব চাইতে বেশি গ্রহণ করে কুশি গজানোর প্রথম ধাপ থেকে আরম্ভ করে কুশি গজানোর মাঝামাঝি সময় পর্যমত্ম ও কাইচথোড় পর্যায়ে। তাই ধানের ভাল ফলন পেতে হলে নাইট্রেজেন সার সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা জমিতে কম সময়ের জন্য থাকে। তাই এ সার তিন কিসিত্মতে প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম কিসিত্ম চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিসিত্ম গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে এবং তৃতীয় কিসিত্ম কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে দিতে হবে। বোরো মৌসুমে যে সব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার কম সেই সকল জাতের জন্য বিঘায় ৩০ কেজি এবং ১৫০ দিনের বেশি জীবনকালের জাতের জন্য বিঘায় ৩৫ কেজি ইউরিয়া সার সমান তিন ভাগে ভাগ করে উপরে বর্ণিত তিন কিসিত্মতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। একই নিয়মে আউশ এবং আমন মৌসুমে বিঘায় ২৩ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রায়োগের সময় জমিতে ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখা সবচাইতে ভাল। সার প্রয়োগের সাথে সাথে হাত বা উইডার দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিলে সার যেমন মাটির সাথে মিশে যায় তেমনি আগাছা না থাকায় ধান গাছ সার বেশি পায়।

এলসিসিঃ লিফ কালার চার্ট বা এলসিসি পস্নাস্টিকের তৈরি চার রঙ বিশিষ্ট একটি স্কেল (চিত্র)। এলসিসি পদ্ধতি ব্যবহার করে ধান গাছের চাহিদা অনুযায়ী ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায়। ফলে ইউরিয়া সারের খরচ কমানো ও অপচয় রোধ করা যায় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এলসিসি ব্যবহার করে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়।

লিফ কালার চার্ট বা এলসিসি

গুটি ইউরিয়াঃ গুটি ইউরিয়া হল, ইউরিয়া সার দিয়ে তৈরি বড় আকারের গুটি যা দেখতে ন্যাপথালিন ট্যাবলেটের মতো। গুটি ইউরিয়ায় সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দফলে ইউরিয়া সার কম লাগে। গুটি ইউরিয়া জমিতে একবারেই প্রয়োগ করতে হয়। গুটি থেকে সব সময় গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী নাইট্রেজেন সরবরাহ থাকায় গাছের কোন সুপ্ত ক্ষুধা থাকে না। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের জন্য রোপণকৃত জমির সারি থেকে সারি এবং গোছা থেকে গোছার দুরত্ব হতে হবে ২০ সেন্টিমিটার। চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে প্রতি চার গোছার মাঝখানে ৭-১০ সেন্টিমিটার কাদার গভীরে গুটি পুঁতে দিতে হবে। জমিতে সব সময় প্রয়োজনীয় ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। সাধারণত আউশ ও আমন ধানের জন্য ১.৮ গ্রাম সাইজের একটি গুটি এবং বোরো ধানের জন্য বড় সাইজের (২.৭ গ্রাম) একটি গুটি ব্যবহার করতে হবে। গুটি প্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনীয় পানি রাখতে হবে যাতে জমির মাটি ফেটে না যায়। গুটি প্রয়োগের পরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অমত্মত ৩০ দিন জমিতে নামা উচিত নয়।

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

খ. টিএসপি (ফসফরাস) সার

ধানের আশানুরূপ ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় ফসফেট সার জমিতে প্রয়োগ করা অতীব জরুরি। ফসফরাস গাছের মূলের বৃদ্ধি ঘটায় এবং মাটি থেকে খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করতে সহায়তা করে।ফসফরাসের অভাবে গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশির সংখ্যা কমে যায়। টিএসপি সাধারণত বোরো মৌসুমে বিঘা প্রতি ১৫ কেজি, আউশে ১২ কেজি এবং আমনে ১৩ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। তবে বোরো মৌসুমে টিএসপি সার মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করলে আউশ ও আমন মৌসুমে সারের মাত্রা অধেক হবে। জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ চাষের সময় ফসফেট সার জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গ. এমওপি (পটাশ) সার

পটাশ সার ধানের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। পটাশিয়াম গাছকে শক্ত সবল করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পটাশিয়ামের অভাবে গাছের বাড়-বাড়তি কমে যায়, ধানের পাতা ছোট হয়ে যায় এবং নিচে দিকে ঝুলে পড়ে। প্রয়োজন অনুযায়ী পটাশ সার জমিতে প্রয়োগ করলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ধান গাছের রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এমওপি সাধারণত আউশ ও আমন মৌসুমে বিঘা প্রতি ৯ কেজি এবং বোরোতে ১৩ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের সময় পটাশ সার জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে ভাল ভাবে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে বেলে মাটির ক্ষেত্রে অর্ধেক সার শেষ চাষের সময় এবং বাকি অর্ধেক সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. সালফার (গন্ধক) সার

বীজতলায় সালফারের অভাব দেখা দিলে চারা হলুদ হয়ে যায়, চারার বৃদ্ধি কম হয় এবং ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না ।এসব চারা জমিতে লাগানোর পর অধিকহারে মারা যায়। কুশি অবস্থায় সালফারের অভাব দেখা দিলে প্রথমে কচি পাতা এবং পরে অন্যান্য পাতাও হলদে হতে থাকে। এ অবস্থায় গাছ খাটো, কুশি কম এবং পাতা ছোট আকার ধারণ করে বিধায় ফলন নাও হতে পারে। কাইচথোড় অবস্থায় সালফারের অভাব দেখা দিলে ছড়ার আকার ছোট হয় এবং দানার সংখ্যা কমে যায়। এমতাবস্থায় ছড়া বের হতে এবং ফুল ফোটতে দেরি হয়। সাধারণত যে সকল জমিতে দীর্ঘদিন পানি জমে থাকে বা ভিজা থাকে সেই সকল জমিতে সালফারের অভাব দেখা দিতে পারে। ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরও ধান গাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়-বাড়তি কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে গন্ধকের অভাব হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে জমির পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমির শেষ চাষের সময় সালফার সার দেয়া যেতে পারে, আবার ধান গাছে সালফারের অভাব দেখা দিলেও উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি বিঘায় ৪-৯ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। এক মৌসুমে সালফার সার প্রয়োগ করলে পরবর্তী ধান ফসলে সাধারণত সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।

ঙ. জিংক (দসস্তা) সার

দসস্তা অন্যান্য সারের মত গাছের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।সাধারণত যে সকল মাটির অমস্লতার মান ৭ এর অধিক, জৈব ও বেলে মাটি এবং দীর্ঘকাল ভিজা থাকে সেখানে দসস্তার অভাব দেখা দেয়। চারা লাগানোর ২-৪ সপ্তাহ পরে দস্তার অভাব দেখা দেয়। ধান গাছ মাঝে মাঝে খাটো হয় বা বসে পড়ে। পুরাতন পাতা মরচে পড়া বাদামি থেকে কমলা রঙ ধারণ করে। ধানের কুশি কম হয়, ধান পাকতে বেশি সময় লাগে এবং চিটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দস্তার অভাব প্রকট হলে কচি চারা মারা যায়।

এসব ক্ষেত্রে প্রথমে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমির শেষ চাষের সময় দসস্তা সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া নিম্মলিখিত উপায়ে ও দস্তার অভাব পূরণ করা যায়, যেমন-

- বীজতলায় জিংক সালফেট প্রয়োগের মাধ্যমে।
- চারা রোপণের পূর্বে দস্তার দ্রবণে চারা কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে। এর জন্য ২০-৪০ গ্রাম জিংক অক্সাইড প্রতি এক লিটার পানিতে ব্যবহার করতে হয়।
- যে সকল জমিতে সব সময় পানি জমে থাকে সে সকল জমি থেকে পানি বের করে জমি মাঝে মধ্যে শুকাতে হবে।

চ. জৈব সার

জৈব সার মাটির উর্বরতার চালিকাশক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই জৈব সার বা সবুজ সার, যথা- পঁচা গোবর, আর্বজনা, কম্পোষ্ট, সবুজ সার, পোল্ট্রি লিটার ইত্যাদি জমিতে বছরে একবার হলেও বিঘা প্রতি ১১ মণ (শুকনা) অথবা ১৮ মণ (ভিজা) হারে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। যে জমিতে জৈব সার একবার ব্যবহার করা হয়, সে জমিতে পরবর্তী ধান ফসলে টিএসপি এবং এমওপি সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। সবুজ সার ধান রোপণের ৩-৪ দিন আগে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

১৬. আগাছা দমন

আগাছা ধানগাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্য সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাছাড়া ধানগাছের চেয়ে আগাছা অধিক হারে বাড়তে পারে। এ জন্য ধানের ক্ষেতে আগাছা থাকলে ধানগাছের বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয় এবং ফলন কমে যায়। ধান গাছ ও আগাছার প্রতিযোগিতার ফলে রোপা আমনে শতকরা ১৫-২০ ভাগ, বোনা আউশে ৩০-৯৯ ভাগ, রোপা আউশে ২৩-৭২ ভাগ এবং বোরোতে প্রায় ৩০-৪০ ভাগ ফলন কমে যেতে পারে। এমতাবস্থায়, ভাল ফলন পেতে হলে ধানের জমির আগাছা সঠিক সময়ে দমন করতে হবে। তাই চারা রোপণের পর ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। রোপা ধানে হাত দিয়ে কমপক্ষে দু'বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমবার ধান রোপণের ১৫ দিন পর এবং দ্বিতীয়বার ৩০-৩৫ দিন পর। ব্রি-উইডার দিয়ে ঘন্টার ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করা যায়। এটি ব্যবহার করা সহজ এবং ওজনে হালকা।

উইডার দিয়ে আগাছা দমন

তবে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত জমিতে আগাছানাশক ব্যবহার করাই উত্তম। আগাছানাশক ব্যবহার করে কম খরচে ও কম সময়ে আগাছা দমন করা যায়। তরল, দানাদার ও পাউডার- এই তিন ধরনের আগাছানাশক পাওয়া যায়। তরল ও পাউডার জাতীয় আগাছানাশক পানিতে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হয় এবং দানাদার আগাছানাশক ইউরিয়া সারের মত ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগকৃত জমিতে ৩০ দিন পর একবার হালকা হাত নিড়ানির প্রয়োজন হতে পারে। বোনা আউশ ধানের জমিতে ধান বোনার ১-২ দিন পরই আগাছানাশক স্প্রে করতে হবে। তবে রোপা ধানের জমিতে রোপাণের ৬ দিনের মধ্যেই আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হবে। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় রোপা জমিতে প্রয়োগের সময় রোপা জমিতে ২-৩ সেমি পানি থাকতে হবে এবং ৫-৭ দিন পানি ধরে রাখলে কার্যকরী ভাবে আগাছা দমন হবে। কিছু অনুমোদিত আগাছানাশক ও ব্যবহার পদ্ধতি সারণী ১-এ দেওয়া হল।

সারণী ১ : অনুমোদিত আগাছানাশক এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি

আগাছানাশক		প্রয়োগের সময়	মাত্রা (বিঘা)	আগাছার ধরন (গ্রুপ)
১.	ম্যাচেটি ৫ জি	রোপণের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	৩.৩৩ কেজি	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
২.	আর গোল্ড ১০ ইসি	রোপণের ৩-৬ দিন পর্যমন্ত	১৪.০০ মিলি	বড় পাতা ও সেজ
৩.	এমসিপিএ ৫০০ ইসি	আগাছার ৩-৫ পাতা পর্যন্ত	১৪.০০ মিলি	বড় পাতা ও সেজ
৪.	রনস্টার ২৫ ইসি	রোপণ বা বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	২৬৭.০ মিলি	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
৫.	রিফিট ৫০০ ইসি	রোপণ বা বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	১৩৩.৩ মিলি	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
৬.	সিরিয়াস ১০ ডব্লিওপি	আগাছার ১-২ পাতা পর্যন্ত	২০.০০ গ্রাম	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
৭.	সানরাইজ ১৫০ ডব্লিওপি	আগাছার ১-২ পাতা পর্যন্ত	১৩.৩৩ গ্রাম	বড় পাতা, ঘাস, সেজ

১৭. সেচ ব্যবস্থাপনা

ধান চাষে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। পানি ধানগাছের শরীর গঠন, পুষ্টি উপাদান আহরণ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই ধানের ভাল ফলন পেতে সেচের কোন বিকল্প নেই।

ক. বোরো ধানে সেচ

চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১৫ দিন পর্যমন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কাইচথোড় আসা আরম্ভ হলে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। আবার ধানের দানা শক্ত হওয়া শুরু করলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার এবং আগাছা দমনের জন্য জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। বোরো চাষে একবার ৫-৭ সেন্টিমিটার সেচ দেওয়ার পর জমিতে দাঁড়ানো পানি শেষ হবার ৩ দিন পর পুনরায় সেচ দিলে ১৫-২০ বার সেচের প্রয়োজন হয়। এতে করে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় এবং সর্বদা দাঁড়ানো পানি থেকে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ পানি কম লাগে।

দাড়ানো পানি

খ. এডব্লিউডি পদ্ধতি

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং (এডব্লিউডি) অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকনো। এই পদ্ধতি হল জমিতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো বা শুকানোর মাধ্যমে প্রয়োজন মাফিক নিয়ন্ত্রিত সেচ দেয়া। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর থেকে এই পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো সেচ ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত চলবে। যখন গাছে থোড় দেখা যাবে তখন জমিতে ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। ধান পাকার ১০-১৫ দিন পূর্বে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এডব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধানে সেচ দিলে ৪-৫টি সেচ বাঁচানো যায় এবং তাতে ফলন ওকমে না। এভাবে এ প্রযুক্তিতে পানি, জ্বালানি ও সময় সাশ্রয় হয়।

ক্ষেত্রে এডব্লিউডি ব্যবহার

গ. সম্পূরক সেচ

আমন ফসল বৃষ্টির অভাবে যদি সাময়িক খরা কবলিত হয় তাহলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে। সম্পূরক সেচের সংখ্যা প্রয়োজনবোধে একের অধিক হতে পারে । বৎসরের শেষ বৃষ্টিপাতের ব্যপকতা ও বর্ষণের সময়ের উপর খরার প্রভাব অনেকাংশে নির্ভরশীল। গবেষণায় দেখা গেছে খরার তীব্রতার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র একটি সেচের মাধ্যমে শতকরা ৬০ ভাগের ও বেশি ফলন বাড়ানো সম্ভব।

খাত থেকে সেচ

সম্পূরক সেচ নিকটস্থ ডিপ অথবা শ্যালো টিউবওয়েল থেকে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া নিকটস্থ নদী, খাল-বিল, পুকুর বা ডোবা থেকে অনায়াসে একটি বা দু'টি সেচ দেয়া যেতে পারে। কারণ তখন পানির কোন অভাব থাকে না। তবে এর জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন। প্রয়োজন মোতাবেক তাৎক্ষনিক সেচ প্রয়োগের জন্য সেচ যন্ত্র, নালা, আর্থিক এবং মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। সম্পূরক সেচের সংখ্যা ও প্রয়োগের সময় নির্ধারণের জন্য বৃষ্টিপাত ও খরার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১৮. পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আবহাওয়া ধানের পোকামাকড় বৃদ্ধির সহায়ক। এ পর্যমত্ম বাংলদেশে ২৬৬টি প্রজাতির ক্ষতিকারক পোকা সনাক্ত করা হয়েছে । এদের মধ্যে ২০-৩৩টি প্রজাতিকে প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রধান ক্ষতিকর পোকার আক্রমণে বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ১৩, ২৪ এবং ১৮ ভাগ ফলন নষ্ট হয়।

ক. ক্ষতির ধরন অনুসারে প্রধান অনিষ্টকারী পোকামাকড়কে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

পোকার শ্রেণী/ বিভাগ		পোকার নাম
অভ্যন্তরীণ খাদক	:	মাজরা পোকা, গলমাছি বা নলিমাছি।
পাতা খাদক	:	পাতামাছি, পামরি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গি পোকা, লেদা পোকা, ঘাসফড়িং, ও লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা।
পাতা শোষক	:	সবুজ পাতাফড়িং, কমলামাথা পাতাফড়িং, আঁকা-বাঁকা পাতাফড়িং ও থ্রিপস।
কান্ড শোষক	:	বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং ও ছাতরা পোকা।
দানা শোষক	:	গান্ধি পোকা।
শিষকাটা পোকাঃ	:	শিষকাটা লেদা পোকা।

দমন পদ্ধতি		ক্ষতিকারক পোকার নাম
জমির পানি বের করে দিয়েঃ	:	পাতামাছি, চুঙ্গি পোকা, বাদামি গাছফড়িং ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং।
জমিতে পানি দিয়ে	:	লেদা পোকা, ছাতরা পোকা ও জমির মাটিতে লুকিয়ে থাকা পোকা।
ডিমের গাদা ও মথ সংগ্রহ করে	:	মাজরা পোকা।
আলোক ফাঁদের সাহায্যে	:	গান্ধি পোকা, মাজরা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং ও গলমাছি।
হাতজাল দ্বারা	:	পামরি পোকা ও অন্যান্য পোকা।
রোপণ দূরত্ব বাড়িয়ে	:	বাদামি ঘাসফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং।
আক্রামন্ত গাছ উপরে ফেলে	:	ছাতরা পোকা।
পোকা প্রতিরোধী জাত চাষ করে	:	সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং ও মাজরা।
ধানের খড়/নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলে	:	মাজরা পোকা, লেদা পোকা, শিষকাটা লেদা পোকা।
পরিমিত ইউরিয়া ব্যবহার করে	:	থ্রিপস।
ধান গাছের পাতার অগ্রভাগ কেটে	:	পামরি পোকা।
জমিতে ডাল পালা পুঁতে	:	প্রায় সকল পোকা।
পরিমিত কীটনাশক ব্যবহার করে	:	সব ধরনের ক্ষতিকারক পোকা।

গ. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে প্রয়োজনে এক বা একাধিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই আর্থিক ক্ষতিসীমার নিচে রাখাকে আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলে। আইপিএম এর উপাদানগুলো নিম্মে বর্ণনা করা হল।

উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী ব্যবস্থাপনা

- উপকারী প্রাণীঃ জৈবিক দমন প্রক্রিয়ায় যেমন- ব্যাঙ, চিল, পেঁচা ও গুইসাপ ইত্যাদি দ্বারা।
- উপকারী পোকামাকড়ঃ মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, বোলতা, ছত্রাক ও নেমাটোড প্রভৃতি অনিষ্টকারী পোকা খেয়ে বালাই নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ করা জরুরি।

বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদ

- ধানের বেশকিছু জাত ক্ষতিকারক পোকামাকড়ে আক্রমণ অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পারে, যেমন-

বিআর১১ ঃ হলুদমাজরা পোকা।
বিআর২২ ঃ হলুদ মাজরা পোকা।
বিআর২৬ ঃ বাদামি গাছফড়িং ও সবুজ পাতাফড়িং।
ব্রি ধান২৭ ঃ বাদামি গাছফড়িং ও পামরি পোকা।
ব্রি ধান৩৩ ঃ সাদা-পিঠ গাছফড়িং।
ব্রি ধান৩৬ ঃ সবুজ পাতাফড়িং।

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ

- সুষম মাত্রায় সার, আগাছামুক্ত জমি, সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও সারিতে চারা রোপণের সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা বালাই দমনে সহায়ক।

বালাই দমনে বিভিন্ন পদ্ধতি

- হাতজালের সাহায্যে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
- আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
- আক্রান্ত পাতার আগা কেটে পোকা দমন।
- ডালপালা পুতেঁ পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করে পোকা দমন।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাপনা

- উপরোক্ত ৪টি পদ্ধতির সাহায্যে যদি ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ দমিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, তখনই কেবল সঠিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

বিকল্প রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

- গাছ গাছড়ার নির্যাসঃ পামরি, বাদামি গাছফড়িংসহ গুদামজাত শস্য পোকার বেলায়ও প্রযোজ্য।
- ফেরোমোনঃ এক ধরণের রাসায়নিক আর্কষক ব্যবহার করে পুরুষ হলুদ মাজরার মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা।

১৯. রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে রোগবালাই অন্যতম। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৩২টি ধানের রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১টি ভাইরাস, ১টি মাইকোপ্লাজমা, ৩টি ব্যাকটেরিয়া, ২২টি ছত্রাক ও ৫টি কৃমি দ্বারা সংঘটিত হয়। বত্রিশটি রোগের মধ্যে ১০টি রোগ ধান চাষে প্রধান প্রতিবন্ধক। এ ১০টি রোগের মধ্যে আবার ৬টি খুবই মারাত্বক, যেমন ধানের ভাইরাসজনিত টুংরো, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া, ছত্রাকজনিত ব্লাস্ট, খোলপোড়া ও বাকানি এবং নেমাটোডজনিত উফরা রোগ। এ সব রোগ ধানের ফলন গড়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ কমিয়ে ফেলতে পারে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব রোগ দমন করা অপরিহার্য। তবে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা নিলে স্বল্প ব্যয়ে রোগ দমন করা সম্ভব। রোগ দমনের পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে রোগ সনাক্ত করা। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ফলে গাছে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসব লক্ষণ দেখে গাছের রোগ চিনতে হয়। রোগ-জীবানু দু'ভাবে ধানের ক্ষতি করে থাকে। ক. পরিমাণগত ক্ষতি খ. গুণগত ক্ষতি। ফলনের ক্ষতি করার ক্ষমতা উপর ভিত্তি করে রোগগুলিকে মূখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।ধানের কয়েকটি মূখ্যরোগের বিবরণ নিম্মে দেয়া হল।

ক. ভাইরাসজনিত রোগ

টুংরো রোগঃএ রোগের বাহক সবুজ পাতাফড়িং। মাত্র ২ মিনিটে আক্রামন্ত গাছে খেয়ে ভাইরাস সংগ্রহ করে। আবার ২ মিনিটে সুস্থ গাছে খেয়ে এ রোগ ছড়াতে পারে। টুংরো আক্রান্ত গাছের পাতায় প্রাথমিক অবস্থায় লম্বালম্বিভাবে শিরা বরাবর হালকা সবুজ ও হালকা হলদে রেখা দেখা দেয়। পরে আস্তে আস্তে সমস্ত পাতাটাই হলদে বা কমলা রঙ ধারণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষেতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'একটি গাছে এবং কিছু কিছু জায়গায় পাশাপাশি অনেকগুলো গাছে লক্ষণ দেখা যায়। চারা বা কুশি অবস্থায় আক্রামন্ত হলে গাছ বেশি খাটো হয়, গাছ দুর্বল হয়ে যায়, কুশি কম হয় এবং শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে গাছ টান দিলে সহজে মাটি থেকে উঠে আসে।

প্রতিকার

- সবুজ পাতাফড়িং এর জন্য ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল) ১৩৩ মিলি/বিঘা বা কুইনালফস (২৫ তরল) ১৫০ মিলি/বিঘা প্রয়োগ করতে হবে।
- হাতজাল দিয়ে সবুজ পাতাফড়িং ধরে মেরে ফেলুন।
- টুংরো আক্রান্ত জমির আশে পাশে বীজতলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

হাতজালে পোকা দমন

খ. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

কৃসেকঃ চারা ও কুশি অবস্থায় সাধারণত কৃসেকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের কারণে গাছটি প্রথমে নেতিয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটি মারা যায়। আক্রান্ত গাছ তুলে গোড়ায় চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মতো আঁঠালো তরল পদার্থ বাহির হয়।

পাতাপোড়া রোগঃ প্রথমে পাতার অগ্রভাগে বা কিনারায় নীলাভ পানি চোষা দাগ দেখা যায়। দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা হলুদ রঙ ধারণ করে পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। শেষের দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং ধুসর বা শুকনো খড়ের রঙ ধারণ করে।

পাতাপোড়া রোগ

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী/সহশীল জাত ব্যবহার করে।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করে।
- চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছিড়ে।
- রোগাক্রান্ত জমির নাড়া ও খড় পুড়িয়ে ফেলে।
- ঝড়ো-বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার না দেয়া।
- রোগ দেখার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ বন্ধ রাখা।
- কৃসেক আক্রান্ত জমি শুকিয়ে ৫-৭ দিন পর আবার পানি দেয়া।

গ. ছত্রাকজনিত মূখ্য রোগসমূহ

বাংলাদেশে ধানের ছত্রাকজনিত রোগগুলো গাছের কোন অংশে এবং বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে বা স্তরে আক্রমণ করে তার একটি তালিকা নিম্মে দেওয়া হলো।

রোগের নাম	গাছের কোন অংশে আক্রমণ করে	গাছের কোন পর্যায় বা স্তরে আক্রমণ করে
১। খোলপোড়া	খোল ও পাতা	কুশি গজানোর শেষ অবস্থায়
২। ব্লাস্ট	পাতা, কান্ডের গিট ও শিষের গোড়া	সকল অবস্থায় তবে চারা অবস্থায় বেশি
৩। খোলপঁচা	ডিগ পাতার খোল	থোড় অবস্থায়
৪। কান্ডপঁচা	খোল ও কান্ড	কুশি গজানো থেকে থোড় অবস্থায়
৫। পাতা ফোস্কা	পাতা	থোড় অবস্থায়
৬। বাকানি	চারার গোড়া ও কান্ড	চারা অবস্থায়
৭। বাদমি দাগ	পাতা ও বীজ	সকল অবস্থায়

খোলপোড়া রোগঃ গাছের সর্বাধিক কুশি অবস্থা থেকে সাধারণত এ রোগটি দেখা দেয়। প্রথমে পানির সমতলে খোলের উপর গোলাকার বা লম্বাটে ধরনের জলছাপের মত দাগ পড়ে। পরে দাগগুলোর মাঝখানে ধূসরবর্ণ ধারণ করে বাদামি দাগদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে সমস্ত খোল ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় দাগগুলো দেখতে অনেকটা গোখরা সাপের চামড়ার মত মনে হয়। বেশি আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ গাছটি ঝলসে যায়।

প্রতিকার

খোলপোড়া রোগ

- রোপণ দূরত্ব ২৫X২০ সেমি বা ২০X২০ সেমি হতে হবে।
- জমিতে শেষ মই দেয়ার পর পানিতে ভাসমান আবর্জনা চট বা কাপড় দিয়ে তুলে মাটিতে পুতে ফেলা।
- রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে আবার পানি দিতে হবে।
- জমিতে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা।
- পটাশ সার সমান দু'কিস্তিতে একভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্যভাগ দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় দিতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে অন্য ফষল চাষ করা।
- নেটিভো, ফলিকুর, কনটাফ, হেক্সাকোনাজল খোলপোড়া রোগ দমনে র্কাযকর ছত্রাকনাশক। আক্রান্ত সম্পূর্ণ ক্ষেত অথবা আক্রান্ত গাছের চার পাশের কয়েকটি সুস্থ গুছিসহ বিকালে গাছের উপরিভাগে যেকোনটি স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশকের মাত্রা লেবেল দেখে স্প্রে করুন।

ব্লাস্টঃ এ রোগটি সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমে বেশি হয়ে থাকে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে বয়স্ক অবস্থা যে কোন সময় গাছ আক্রামত্ম হতে পারে। এ রোগটি ধানের পাতা, গিট ও শিষ আক্রমণ করে। সে অনুসারে এ রোগকে পাতা ব্লাস্ট, গিট ব্লাস্ট ও শিষ ব্লাস্ট বলে। পাতায় প্রথমে ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি দাগ পড়ে। পরে দাগের দু'প্রান্ত লম্বা হয়ে এবং মাঝখানটি প্রস্থ হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের ভিতরে ধীরে ধীরে ছাই রঙ এবং চারিদিক বাদামি দাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। একাধিক দাগ মিশে পাতাটিকে মেরে ফেলে। বেশি আক্রমণকাতর জাতের ধান হলে সমস্ত গাছটিই মারা যেতে পারে। গিটে ব্লাস্ট হলে ধানের কান্ডের গিটে এবং পাতার খোলের সংযোগস্থলে কালো দাগ পড়ে ও পচে যায়, ফলে গিটের উপরের অংশ ভেঙ্গে ঝুলে থাকে। ধানের শিষ ব্লাস্ট হলে শিষের গোড়া কালচে হয়ে পচে যায় এবং উপরের অংশ শুকিয়ে যায় এবং ধান চিটা হয়। এ অবস্থায় মাজরা পোকার ক্ষতি বলে ভুল হতে পারে। ধান আধা পাকা অবস্থায় শিষ ব্লাস্ট হলে আক্রমনাক্ত জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে ও ধান চিটা বা অপুষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা।
- জমিতে পানি ধরে রাখা।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা। আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ রাখা।
- বিঘা প্রতি ৫৩ গ্রাম ট্রুপার, জিল বা নেটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে আক্রামত্ম জমিতে দু'বারে প্রয়োগ করুন।

ব্লাস রোগে আক্রান্ত গাছ

ঘ. নেমাটোড বা কৃমিজনিত রোগ

উফরাঃ উফরা ধানের কৃমিজনিত রোগ। এ কৃমি এত ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। এটি ধান গাছের কচি পাতা ও খোলের সংযোগস্থ'লে আক্রমণ করে। কৃমি গাছের রস শোষণ করায় প্রথমে পাতার গোড়ায় ছিটে-ফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে সে দাগ বাদামি রঙের হয়ে পুরো আগাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে গাছের বাড়-বাড়তি কম হয়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে শিষ মোচড়ানো অবস্থায় থেকে যায়। ফলে শিষ বের হতে পারে না। উফরা রোগের কৃমি পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটা এবং ঘাসে এমনকি মাটিতে কুন্ডলী পাকিয়ে বেঁচে থাকে।

প্রতিকার

- রোগ দেখা দিলে কার্বোফুরান জাতীয় কৃমিনাশক বিঘা প্রতি ২.৫ কেজি হারে (যেমন- ফুরাডান ৫জি অথবা কিউরেটার ৫জি) প্রয়োগ করুন।
- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- সম্ভব হলে মৌসুমের প্রথমে জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন ফেলে রাখুন।
- আক্রান্ত জমিতে বীজতলা করবেন না।
- ধানের পরে ধান আবাদ না করে অন্য ফসলের চাষ করুন।

উফরা রোগ

২০. ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

ধানের ছড়ার উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলেই ধান পেকেছে বলে বুঝতে হবে এবং বিলম্ব না করেই ধান কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শিষ ভেঙ্গে যায়, শিষকাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা উচিত। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিন। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকানোর পর ভাল করে ঝেড়ে গোলাজাত বা বাজারজাত করুন।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে ধানের সার্বিক ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে ধান চাষের প্রতিটি স্তরের করণীয় ও পরিচর্যা সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অন্যথায় ধানের ফলন কমে লাভের চেয়ে খরচ বেড়ে যাবে। অতএব লাভজনক ধান চাষে কাঙ্খিত ফলনের কোন বিকল্প নেই।